OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 275 - 284
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সমরেশ বসুর ‘যুদ্ধের শেষ সেনাপতি’ : পর্যালোচনার আধারে

ড. ঈশ্বর চন্দ্র বর্মন
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার
বাংলা বিভাগ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়
Email ID: iswarchbarman@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Adab, Myth, Construction-Di-construction, Kurukshetra Judhyo, Arya-On-Arya, Ashwathama, Ashwathama hato iti gajo.

Abstract
Samaresh Basu made his debut in Bengali literature in 1946 with the short story titled ‘Adab’. Amidst the turbulent socio-political climate of the era, Basu’s distinctive writing style and analytical perspective established him as a unique figure in the literary landscape. A prime example of this analytical approach is his novel ‘Yuddher Sesh Senapati’, published in 1984. Through his analytical lens, he has effectively reimagined this mythological subject matter. The novel offers a meticulous analysis of the political conflicts between the Kaurab and the Pandab , as well as the complex vortex of the Kurukshetra War. In this work, the author highlights the root causes of the Kurukshetra War while simultaneously addressing the conflict between the Aryans and the non-Aryans. Ashwatthama—the son of Dronacharya and the last commander of the Kurukshetra War—serves as the protagonist of this novel. While he effectively brings to the forefront various aspects of the Mahabharata War—such as its causes and chronology—he also analysis the Aryan-non-Aryan dichotomy within a contemporary context. Simultaneously, he grounds these mythological characters in the realm of reality. He portrays Krishna as a political figure, while subjecting characters such as Satyavati and Vyasadeva to scathing criticism. He depicts Duryodhana as a flesh-and-blood human being— battered and scarred by a prolonged struggle. Above all, the protagonist Ashwatthama embodies the author's philosophical perspective regarding the people of this earthly world. This research paper endeavors to explore and elucidate these various themes.

Discussion

“একজন কৃষক যদি টাকার জন্যে চাষ করতে পারে আমি কেন টাকার জন্য লিখব না?”

এই মুখোশহীন মানুষটি হলেন সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)। সমরেশ বসুর জন্ম বাংলাদেশের ঢাকা শহরের মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রাজনগর গ্রামে ১৯২৪ সালের ১১ই ডিসেম্বরে।[১] পিতা চিত্রকর মোহিনীমোহন বসু এবং মাতা শৈবলিনী দেবী। তাঁদের চারপুত্র ও এক কন্যা। এই সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল সমরেশ বসু। তাঁর পিতৃদত্ত নাম সুরথনাথ বসু।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরবর্তীকালে শ্যালক তাঁর নাম দেন সমরেশ। মোহিনীমোহন বসু ও শৈবলিনী দেবীর অকাল মৃত পুত্র-কন্যাদের সংখ্যা অনুযায়ী সমরেশ বসু ছিলেন অষ্টম। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী আমরা জানি অষ্টম গর্ভের সন্তান ব্যতিক্রমী চরিত্রের হয়ে থাকে। সমরেশ বসুও ছিলেন এই ব্যতিক্রমী চরিত্রের।

ব্যতিক্রমী এই চরিত্রটি স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুর্বিসহ সময়কালে, ১৯৪৬ সালে দেশের যখন উত্তপ্ত জটিল পরিস্থিতি তখন শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রথম ছোটগল্প 'আদাব'।[২] এই গল্পটি পাঠক মহলে তাঁকে পরিচিতির পথ খুলে দেয়। সাহিত্যজগতে তাঁর মুহূর্তটিকে সামাজিক-রাজনৈতিক সবদিক থেকে সমস্ত দেশ ও সমাজ বলা যায় এক যুগান্তরের মুখোমুখি হয়েছে। এই যুগ পরিবর্তনের উত্তাপ-গ্লানি-যন্ত্রণা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।[৩] সমরেশ বসুর লিখনিশৈলী, বিশ্লেষণী দৃষ্টি তাঁকে স্বতন্ত্রতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। তাঁর এই বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম দৃষ্টান্ত হল 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি'। পৌরাণিক এই বিষয়টিকে তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা যেন নবনির্মাণ করেছেন।

'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' (১৯৮৪)[৪] উপন্যাসে কৌরব ও পাণ্ডবদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তথা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জটিল আবর্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই উপন্যাসে লেখক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আসল কারণ ও সেই সাথে আর্য ও অনার্য দ্বন্দের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ সেনাপতি রূপে দ্রোনাচার্য পুত্র অশ্বত্থামা আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক। এই বীর যোদ্ধা মৃত্যুপথ যাত্রী দুর্যোধনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েই পাঞ্চালবংশ ধ্বংস করেছিলেন। মহাযুদ্ধের শেষ দিনে কৌরব বাহিনী যখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, ঠিক তখনই এই হতোদ্যম ও রণক্লান্ত সৈন্যবাহিনীর সামনে সক্রিয় এবং সজীব, প্রতিজিঘাংসু শেষতম নায়করূপে তাঁকে কালকূট কল্পনা করেছেন। সেই নায়ক নিয়তি অমোঘ জেনেও হার মানে না। আহত, সম্মান, অসহায় প্রতিহিংসা, নিরুপায় অথচ গভীর জীবনার্তি।[৫]

উপন্যাসের সূচনায় লেখক মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু লেখক মনে করেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা তো ভাই-ভাইপোদের রাজত্ব – সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে। এখানে পাণ্ডবরা জিতলেও, সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন দু-পক্ষই। তাহলে সাধারণ ভাবে দেখলে ধর্মযুদ্ধ হয় কি করে? দ্বিতীয়ত, মৎস্যগন্ধা বা গন্ধকালী একজন অনার্য রমণী ছিলেন। ব্যাসদেব সেদিক থেকে এক অনার্য রমনীর জারজ সন্তান। এখানে প্রশ্ন সেই সময়ে অনেক আর্য ব্রাহ্মণ শিক্ষিত ব্যক্তি থাকতেও, এক অনার্য রমণীর জারজ সন্তান কেন সেই যুদ্ধ কাহিনি লিখেছিলেন? আরও প্রশ্ন, তিনি কি বাস্তবিক লেখাপড়া শিখেছিলেন?

আর্য-অনার্যের মিলন হলেও ভিতরে একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব থেকেই গিয়েছিল। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ মহাভারত মহাকাব্য। এখানেও লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং আবিষ্কার চোখে পড়ার মতো। রচয়িতা ব্যাসদেব নিজে একজন অনার্য সন্তান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ দুই ভাইয়ের সংঘর্ষ যারা ছিলেন তৎকালীন দুই নেতা ভীষ্ম এবং ব্যাসদেব। ভীষ্ম যেমন শান্তনুর ঔরসজাত তেমনি ব্যাসদেব সত্যবতীর গর্ভজাত। ব্যাসদেব, ভীষ্ম ও বিচিত্রবীর্য প্রকৃতপক্ষে তাদের পিতা ও মাতার পরিচয়ে তিন ভাই। এদের ভিতর একমাত্র ভীষ্ম হলেন আর্যসন্তান। কারণ তিনি রাজা শান্তনু ও গঙ্গার সন্তান যারা সামাজিকভাবে বিবাহিত দম্পতি। কিন্তু সত্যবতী অনার্য নারী। শান্তনু ও সত্যবতীর সন্তান চিত্রাঙ্গদ মৃত এবং বিচিত্রবীর্য রাজা হয়েও কামুক, রুগ্ন ও নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। সত্যবতী ছিলেন ভীষণ মহিলা যিনি কখনোই ভীষ্মকে রাজ অধিকার দিতে চাননি। শান্তনুকে বিবাহের সময়েই তার শর্ত ছিল নিজের গর্ভজাত সন্তান রাজ্যভার পাবে। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর তাই নিজ কানীন পুত্র ব্যাসদেবকেই তিনি বংশ রক্ষার জন্য অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। পাণ্ডব ও কৌরবরা কেউই কুরু বংশের রক্ত নয়। কথায় বলা হয়, ভাই ভাইপোদের যুদ্ধ। কিন্তু এক্ষেত্রে কাদের ভাই কারা? প্রকৃত কুরুবংশীয় হলেন একমাত্র ভীষ্ম যার সাথে পিতার স্ত্রী সত্যবতীর অনার্য পুত্র ব্যাসদেবের দ্বন্দ্বই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান কারণ বলে লেখক মনে করেন।

কুরুবংশের ধ্বংসকারী রূপে লেখকের সন্দেহ তিন অনার্যের ওপর বর্তায়। তারা হলেন ব্যাসদেব, কৃষ্ণ এবং দ্রৌপদী। কিভাবে এই সন্দেহের নিরসন তিনি করেছেন তারও ব্যাখ্যা একদিকে যেমন ইতিহাসের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়েছে অপরদিকে তেমনি ঔপন্যাসিক রসতত্ত্বের গুণে হয়েছে ভরপর। তিনি দেখিয়েছেন কৃষ্ণের গায়ের রং ছিল কালো। তবে কি যাদব বংশীয় কৃষ্ণ ছিলেন অনার্য? কংসের বোন দেবকীর বিবাহ হয়তো কোনও অনার্য ঘরেই হয়েছিল। তাই কংস বোনের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছেলেদের জন্ম হতে হতেই মেরে ফেলতেন। কৃষ্ণকে বাঁচানো হয়েছিল শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে। তিনি বেড়ে ওঠেন গোপ সমাজে। শাক্ত আয়ান ঘোষের ঘরণীর সাথে তার মেলামেশা ছিল। সেই সময় অনার্যরাই ছিল শাক্ত। আয়ান ঘোষ নপুংসক না হলেও রাধা কৃষ্ণের শক্তিমত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কৃষ্ণ যদি কোনো নিষাদ ঘরেরই সন্তান হন তবে নিষাদরাই যদুবংশ ধ্বংসের জন্য দায়ী। বিচিত্র গতিতে ইতিহাস নতুন বাঁক নিয়েছে। ভীষ্ম আর্য, ব্যাসদেব অনার্য। সত্যবতী ছলে বলে ব্যাসদেব দ্বারা দুই পুত্রবধূর বংশরক্ষা করেছেন। অথচ পাণ্ডবদের প্রতি ব্যাসের ছিল বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। কারণ ব্যাসের মতো পাণ্ডবরাও ছিলেন জারজ সন্তান।

লেখক ইতিবৃত্তীয় সংকেতে দেখতে পেয়েছেন কৃষ্ণের মতো কুশলী ও রাজনীতিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির গতিবিধি। জরাসন্ধ ছিলেন কৃষ্ণের চিরশত্রু এবং তাকে নিহত বা পরাজিত করা কৃষ্ণের পক্ষেও ছিল দুরূহ। তাই পঞ্চপাণ্ডবের সাথে তিনি বন্ধুত্ব করেছেন জরাসন্ধকে পরাজিত করার জন্যই। দ্রৌপদীর সাথেও তার বন্ধুত্ব ছিল। এছাড়া আত্মীয়তার দিক থেকে পাণ্ডবরা ছিল তার পিসতুতো ভাই। লেখক দেখিয়েছেন দ্রৌপদীর জন্ম রহস্যের জটিলতাকে। দ্রুপদ রাজার যজ্ঞকুণ্ডে একই সাথে দ্রৌপদী এবং তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃষ্টদুম্নের জন্ম। এর আগে দ্রুপদের সন্তান ছিল শিখণ্ডী যাকে মহাভারত-এর আদিপর্বে প্রথমে পুত্র এবং পরে কন্যা বলা হয়েছে। আসলে শিখণ্ডী একজন হিজড়ে অথবা নপুংশক ব্যক্তি। এরপর নিঃসন্তান দ্রুপদ যজ্ঞকুণ্ড থেকে যাদের পেলেন তারা হয়তো তার পুরোহিতের সন্তান।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তৃতীয় কারণ হল কুরু-পাঞ্চাল বিরোধ। যার নেতা হলেন দ্রোণ। ভরদ্বাজমুনির পুত্র দ্রোণ। ঋষি ভরদ্বাজ এবং রাজা পৃষত ছিলেন দুই সখা। দ্রোণ ছেলেবেলায় পৃষতের পুত্র দ্রুপদের বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীকালে দ্রুপদ রাজা হন এবং দ্রোণ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে পরশুরামের অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে রাজা দ্রুপদের সাথে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দ্রুপদ তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতে তাদের অসম বন্ধুত্বকে স্বীকার করেননি। সেখান থেকেই দ্রোণ দ্রুপদের বিরোধের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে কৌরব-পাণ্ডবদের শিক্ষাগুরু দ্রোণ তার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ কৌরব এবং পাণ্ডবদের দ্রুপদ রাজার বিরুদ্ধে চালিত করেছিলেন। অথচ অর্জুন দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বর সভায় লাভ করার মধ্য দিয়ে দ্রুপদ রাজের সাথে পাণ্ডবদের সখ্যতা গড়ে ওঠে। ধর্মযুদ্ধ বলতে কোনও অনুষ্ঠানমূলক যুদ্ধ নয়, তা ন্যায়যুদ্ধ।

কিন্তু কালকূট দেখেছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়। এর অনেকগুলি কারণ। তার মধ্যে অন্যতম যেমন ব্যাসদেবের চক্রান্ত এবং পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তেমনি ভীষ্মকে পরাজিত করার ছলনা। শিখণ্ডীকে দেখেই ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভে তাকে নপুংশক দেখিয়ে অমঙ্গল যাত্রা করানো হয়েছে। অর্জুনের কর্ণ বধও ন্যায় মেনে সংগঠিত হয়নি। আর সর্বোপরি 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলে ধৃষ্টদুম্নের দ্রোণ হত্যা। এসবই পাণ্ডবদের ষড়যন্ত্রমূলক। এমনকি দুর্যোধন হত্যার মধ্যেও ছিল ন্যায়ের অভাব। দুর্যোধন কোনও দিনই পাণ্ডবদের কুরু বংশীয় মনে করেননি। তার এই সন্দেহ ছিল স্বাভাবিক। কারণ পঞ্চ পাণ্ডবের জন্মের খবর হস্তিনাপুরীতে এসে পৌঁছায়নি। কুন্তী এবং মাদ্রীর উপপতিদের দ্বারা সৃষ্ট সন্তানদের নিয়ে কুন্তী একা রাজপ্রাসাদে এসেছিলেন যখন দুর্যোধনের ষোলো বছর বয়স। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শল্য নিহত হওয়ার পর দুর্যোধন প্রাণ ভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করেছিলেন। তার সেই গোপন আশ্রয়ের সংবাদ ভীমকে জানায় একজন নিষাদ। ইতিমধ্যে শল্য রাজ, শকুনি নিহত। কেবল জীবিত রয়েছেন দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা, কৃপ এবং কৃতবর্মা। যুদ্ধে দুই শিবিরেই নিহত হয়েছে অনেক। তথাপি পাণ্ডব শিবিরে রীতিমত উল্লাস, উৎসব। শকুনির কাটা মুণ্ডু এবং শল্য রাজ বধের জন্য সেই উৎসব মুখরতা। কারণ শকুনির মতো ধূর্ত নেতা এবং ভীম অর্জুনের থেকেও বড় যোদ্ধা ছিলেন শল্য। অথচ পাণ্ডব শিবিরে অভিমন্যু বধ যতটা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, ততটা নয়। অভিমন্যু নিজেই বীরত্ব দেখিয়ে সপ্তরথীর ব্যূহে প্রবেশ করেছিল। সপ্তরথী তাকে কোনও অস্ত্রাঘাত করেনি। কারণ সপ্তরথীরা ছিলেন -দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্রথ, কৃতবর্মা। জয়দ্রথের হাতে অভিমন্যু নিহত হয়েছে। কিন্তু দুর্যোধনের ব্যাপারে ঘটেছিল এক পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। নিষাদের মুখে দুর্যোধনের গোপন আশ্রয়ের সংবাদ পেয়ে ভীম এবং যুধিষ্ঠির নিষাদকে প্রচুর লুঠের অর্থ এবং সোনা দান করেন। অতঃপর আক্রমণ করেন দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং কৃতবর্মাকে। দুর্যোধন বলেছিলেন, তিনি রণক্লান্ত, একা, অসহায়। অতএব যুদ্ধনীতির পরিবর্তন ঘটুক এবং তাকে লোকবল এবং অস্ত্রবল প্রদান করা হোক। অথবা একা তিনি প্রত্যেকের সাথে পৃথকভাবে দ্বৈরথ যুদ্ধ করবেন। আরো বলেছিলেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক এবং যুধিষ্ঠির সিংহাসনে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বসুক। হরিণের চামড়া পরে তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেই সময় যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করেন, কৌশল বাতলান। এরপর গদাযুদ্ধে অধিক পারঙ্গম দুর্যোধন ভীমকে প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলেছিলেন। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির ঘোষণা করেছিলেন একজনকে বধ করতে পারলেই রাজ্য দুর্যোধনের। কৃষ্ণ বুঝেছিলেন ন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে নিরস্ত করা দুঃসাধ্য। গদাযুদ্ধের সময় তাই কৌশলে ভীমকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন একদা দ্রৌপদীর অপমানের জন্য তার উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞার কথা। দুর্যোধন যখন গদা নিয়ে শূন্যে লম্ফন করেন তখনই অন্যায়ভাবে তার উরুতে আঘাত করলেন ভীম। ধরাশায়ী দুর্যোধনকে মাথাতেও আঘাত করলেন পা দিয়ে। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, এ অধর্ম হল। প্রতিবাদ করেছেন বলরামও। তাঁর মতে নাভির নীচে গদাঘাত অন্যায়। দুর্যোধন মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণ সম্পর্কে যে সমস্ত সমালোচনা করে গেছেন তা লেখক যথাযথ তুলে ধরেছেন। দুর্যোধনের উক্তি তার চারিত্রিক মাহাত্ম্যকেই প্রকট করেছে। তার বক্তব্যের সারবত্তা রাজনৈতিক কূট কৌশলের এমন একদিক যা বর্তমান আধুনিক সমাজেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

আলোচ্য উপন্যাসের নাম ‘যুদ্ধের শেষ সেনাপতি’। এখানে শেষ সেনাপতি বলতে অশ্বত্থামার কথা বলা হয়েছে। অশ্বত্থামা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ সেনাপতি। দুর্যোধনের যখন করুণ অবস্থা তখন দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে বরণ করে যুদ্ধে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। উপন্যাসে আমরা দেখি ভীমের মাংস সংগ্রহকারী নিষাদরা এসে দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে লুকিয়ে থাকার গোপন সংবাদটি দেয়। পাঁচ ভাই, কৃষ্ণ আর সৈনিকরা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ঘোড়া ছোটালেন দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে। তাঁদের আসতে দেখে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা দ্রুত নিজেদের ঘোড়া ছুটিয়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পরলেন। দুর্যোধনের কী গতি হয়, সেটা দেখবার জন্য নিষাদ, চাষা-ভূষা যত ছিল, সব দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে গিয়ে জমায়েত হলো। এমন সময় বলরাম নানা তীর্থ ঘুরে এসে তিনিও উপস্থিত হলেন।

যুধিষ্ঠির দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে গিয়ে দুর্যোধনকে কটূক্তি করে ডাকলে দুর্যোধন যে রণক্লান্ত তা তিনি জানিয়ে দেন। দুর্যোধন চাননা এখন আর যুদ্ধ করতে। তিনি বাকি জীবনটা হরিণের ছাল পরে বনে বনে কাটিয়ে দেবেন বলে জানিয়ে দেন। তিনি এটাও বলেন তিনি আর সিংহাসন নিয়ে বিরোধ করতে চান না কিন্তু যুধিষ্ঠিরের উক্তি—

> “আমি এমন মূর্খ নই, তোমাকে জীবিত রেখে সিংহাসনে গিয়ে বসবো। তুমি রাজ্য দেবার কে? তুমি যুদ্ধ চেয়েছিলে, আজ তোমার সেই যুদ্ধের আশ মিটিয়ে ছাড়বো। মনে নেই, আমাদের সঙ্গে কী জঘন্য আচরণ করেছো? মনে নেই, আমাদের ঘর পুড়িয়ে, বিষ খাইয়ে মারতে চেষ্টা করেছিলে? তুমি যদি প্রকৃতই ধৃতরাষ্ট্রের ঔরস্যজাত সন্তান হও, তবে উঠে এসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করো।”[৬]

যুধিষ্ঠির নানা ভাবে কটূকথায় দুর্যোধনকে উত্তেজিত করলে দুর্যোধন শেষপর্যন্ত হ্রদ থেকে ভেজা গায়ে উঠে আসেন এবং একজনকে করে যুদ্ধে আসতে বলেন। এই প্রস্তাবে যুধিষ্ঠিরও রাজি হয়। প্রথমে দুর্যোধন বেছে নেন ভীমকে। এদিকে ভীম যত বড় বীরই হোক, গদা যুদ্ধে দুর্যোধন অনেক নিপুণ। ভীম তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে কেবল ন্যায় যুদ্ধ করেই যাচ্ছিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে একান্তে ডেকে জানিয়ে দেন অন্যায় যুদ্ধ ছাড়া দুর্যোধনকে বধ করা সম্ভব নয়। দুর্যোধন তেরো বছর গধা যুদ্ধ শিখেছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংকেত করতে বলে দেন। অর্জুন ভীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নিজের বাঁ জানুতে আঘাত করে সংকেত দেন। ভীমের মনে পড়ে প্রতিজ্ঞার কথা। দুর্যোধন যখন লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে ভীমের মাথা লক্ষ করে গদা চালাতে যাবেন ঠিক এই সময় ভীম দুর্যোধনের জানু জোড়া লক্ষ করে সজোরে গদা ছুঁড়ে মারেন এই অন্যায় আঘাতে, অপ্রস্তুত দুর্যোধন দুই উরু ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আর উঠতে পারলেন না। তখন পাণ্ডব পাঞ্চালরা ভীষণ উল্লাস আর কলরবে মেতে উঠে, ভেরী, শঙ্খ, ঢাক বেজে উঠল। সেই শব্দে বোনের হরিণ পাখিরাও চিৎকার শুরু করে দেয়। সেখানে উপস্থিত বলরাম এই অন্যায় যুদ্ধ মেনে নিতে পারেন না। তিনি জানিয়ে দেন নাভীর নীচে গদাঘাত অন্যায়। কৃষ্ণ বিপদ বুঝে বলরামকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ বলরামকে জানিয়ে দেন—

> “আপনি ক্রোধ সংবরণ করুণ। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ছাড়া, এই সদ্য কলিযুগে ভীমের আর কোন উপায় ছিল না। আপনি নিবৃত্ত হোন।”[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভীম যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দেয় আপনার পৃথিবী এখন শত্রু শূন্য। আপনি নিশ্চিন্তে রাজ্য ভোগ করতে পারেন। ভীমের সেবক ও চিকিৎসকরা যখন ভীমকে শুশ্রুষা করা শুরু করলেন তখন দুর্যোধন রক্তাক্ত অবস্থায় দুই জানু ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে যন্ত্রনায় ছটফট করছেন। দুর্যোধন তাঁর হেরে যাওয়া অথবা কৌরবদের হেরে যাওয়ার পিছনে কৃষ্ণকেই দায়ি করেন। দুর্যোধনের স্বগতোক্তি—

> "ওহে কংসের দাস - তনয় অনার্য কৃষ্ণ, তোমার কথাতেই ভীম অন্যায় যুদ্ধে আমার উরু ভেঙেছে। তুমিই এই অধর্ম যুদ্ধের সংকেত দিয়েছো। তোমার অন্যায় পরামর্শেই আমাদের পক্ষের বীরেরা একে একে মারা গেছেন। তুমি নীচাশয়, পিতামহ ভীষ্মের সামনে শিখণ্ডীকে এগিয়ে দিয়েছিলে। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ - এই মিথ্যা কথা শোনাবার পরামর্শ দিয়ে তুমিই দ্রোণকে নিরস্ত্র করেছিলে। কর্ণ অর্জুনকে হত্যা করার জন্য সেসব অস্ত্র সংগ্রহ করেছি, তুমিই কৌশল করে সেসব অস্ত্র দ্বারা কর্ণকে দিয়ে ঘটৎকচ বধ করিয়েছো। অর্জুনের মৃত্যু ব্যর্থ করে দিয়েছ। সাত্যকি তোমারেই অন্যায় প্রেরণায়, হাত কাটা অবস্থায় ভূরিশ্রবা যখন খাদ্য পানীয় বর্জন করে মৃত্যুর সংকল্প করেছিলেন, তাঁকে হত্যা করিয়েছ। কর্ণের রথের চাকা বসে যাওয়া সত্বেও অর্জুনকে হত্যার প্রেরণা জুগিয়েছ। জানতে, তা নইলে পাণ্ডব পাঞ্চালদের জয় সম্ভব নয়। তুমি অনার্য, পাপাত্মা, নির্লজ্জ, নির্দয় ছাড়া আর কিছুই নও।"[৮]

অন্যদিকে কৃষ্ণ দুর্যোধনের যাবতীয় অন্যায়, পাপ কার্যের কথা শোনাতে ছাড়েন না। পান্ডবরা ফিরে যাওয়ার পথে দুর্যোধনের নিজস্ব শিবিরে পাণ্ডবরা শেষবারের মত লুটপাট করে নিল।

এরপর সঞ্জয় এলেন দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধন তখনও বেঁচে আছেন। ছুটে আসেন অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা। অশ্বত্থামা ঘোড়া থেকে নেমে দুর্যোধনের অবস্থা দেখে কান্না রোধ করতে পারেন না। তিনি জানিয়ে দেন—

> "মহারাজ পাণ্ডবরা আমার পিতাকে যখন কূটযুদ্ধে হত্যা করেছিল তখন যত কষ্ট পেয়েছি এখন তোমার অবস্থা দেখে তার থেকেও বেশি কষ্ট পাচ্ছি। যাইহোক, আমি তোমার কাছে দান ধর্ম সুকৃত সত্য দ্বারা শপথ করছি, কৃষ্ণের সামনেই আজ আমি সমস্ত পাঁঞ্চালদের হত্যা করবো। তুমি আমাকে অনুমতি দাও।"[৯]

দুর্যোধনের নির্দেশে কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিসিক্ত করেন। অশ্বত্থামা শেষবারের জন্য দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে, ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলেন। কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মাও ঘোড়ায় উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন। আর জীবন্মৃত দুর্যোধনকে ঘিরে এলো মাংসভুক পশুর দল। দুর্যোধন সেই সব পশুর ভয়ংকর চোখগুলোকে, তাঁকে ঘিরে জ্বলজ্বল করতে দেখলেন। ক্রমেই তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। মাংসভুক পশুরা যখন তাঁকে ঘিরে এলো, তিনি সজোরে হাত ছুঁড়লেন। কিন্তু তাঁর আর সে জোর ছিল না। মাংসভুক পশুরা লাফিয়ে থাবা নিয়ে, দাঁত বসিয়ে তার মাংস ছিঁড়ে নিতে লাগলো।

ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া, একে বোধ হয় আর কিছু বলা যায় না। দূরে, অন্ধকারে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন, অনার্য রমণীর সেই জারজ পুত্রটি। এ ঘটনার তিনিই তো শেষ দর্শক। তাঁর নিজের বাবা মায়ের সন্তান না হয়েও, ভীষ্মই ছিলেন কুরুকুলের অধিপতি। তিনি চেয়েছিলেন, আর্য কুরুবংশের থেকেও, তাঁর মতো অনার্যের ধর্মচর্চা বেশি বড়। শান্তনু বেঁচে থাকলে বুঝতে পারতেন, তাঁর পুত্র ভীষ্মের ঘটকালীতে গন্ধকালীকে বিয়ে না করলে, ভীষ্মকে বঞ্চিত না করলে, বংশের ইতিহাস হয়তো অন্য রকম হত। কে বলতে পারে, ভীষ্ম যদি অম্বিকা অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতেন, তাঁরা অসুস্থ অভিশপ্ত হতেন কিনা। একজন হয়েছিলেন অন্ধ, অন্যজন অধিক কোনো জটিল রোগগ্রস্ত। পাণ্ডু যদি নিজে কুন্তী আর মাদ্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে পারতেন, তাহলে শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে পাঁচটি কুরুরক্ত ঔরসজাতহীন অজ্ঞাতকুলশীল ছেলে এসে কুরু রাজ্যের অংশ দাবি করতে পারত না। দুর্যোধনের মনে কি চিরকালই একটা সন্দেহের বীজ ছিল না, যাঁরা পাঁচ ভাই বলে সিংহাসনের দাবি করেছিলেন, তাঁদের বস্তুত জন্মই হয়েছিল কৌরবকুলকে ধ্বংস করতে?

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক মহাভারতের ঘটনাপ্রবহকে সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যাসদেবকে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। দুর্যোধনের জীবনের অন্তিমলগ্ন তিনি দূর থেকে দেখেছিলেন। কীভাবে তাঁকে মাংসভুক পশুরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খাচ্ছে। সম্পর্কে তিনি দুর্যোধনের পিতামহ। সাত্যকি যখন সঞ্জয়কে হত্যা করতে গিয়েছিল, তিনি তাঁকে অবধ্য বলে বাঁচিয়েছিলেন। তার অর্থ, তিনি যুদ্ধেও কিছু ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যতগুলো কূট যুদ্ধের পরামর্শ দিয়েছিলেন, একবারও এসে বারণ করেননি। এটা কি পক্ষপাতদুষ্ট কাজ নয়? তিনি ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। অতএব অশ্বত্থামার অস্ত্রে অর্জুন আর কৃষ্ণ যখন পর্যুদস্ত, এবং পরে সামলে নিয়েছিলেন, তখন অশ্বত্থামার অস্ত্র প্রয়োগের ব্যর্থতার প্রশ্নে, পুনর্জন্মের গল্প বলেছিলেন। দ্রোণকে মিথ্যাকথা বলে হত্যার সময় তাঁর বিবেকে লাগেনি। তাঁর কারণ কি কেবল এই, দ্রোণ ব্রাহ্মণ হলেও ক্ষত্রিয় ধ্বংস করেছিলেন? প্রশ্ন অনেক। জবাব বোধহয় সেই পরিমাণে নেই।

দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তিনি দুর্যোধনের করুণ, মাংসভুক পশুর আক্রমণে যন্ত্রণায় তিলে তিলে মৃত্যু দেখলেন। এই দুর্যোধনের জন্মের সময় নানা অশুভ সংকেত দেখা দিয়েছিল। তখন ব্যাসদেব তাঁর মাকে বলেছিলেন, সামনে অতীব অশুভ দিন আসছে। শতশৃঙ্গ পর্বতে কুন্তী আর মাদ্রী যে সময় দেব পুরুষদের দ্বারা নিজেদের গর্ভবতী করেছিলেন, আর একটি করে পুত্র জন্ম দিচ্ছিলেন, তখন একথা উচ্চারণ করেননি। আজ অগ্রহায়ণের শেষ দিনে, অমাবস্যার অন্ধকারে, দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে যেই অশুভ দিনের সমাপ্তি দেখছেন। নির্বিকল্প মহাপুরুষ তিনি। তাঁর মুখে কোনো বিকার নেই। এখন তাই তিনি ঐতিহাসিকের অবিচলিত চোখে কুরুকুলের শেষ সন্তানের ভয়ংকর অবসান দেখছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের নাম 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' হ্যাঁ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ সেনাপতি। এখানে অশ্বত্থামাকে নির্দেশ করা হয়েছে। সেই সাথে লেখক চরিত্রটিকে একজন সৎ, বিবেকবান, বিবেচক বীর করে তুলেছেন। তার আত্ম সমালোচনা আমাদের হৃদয়কে বেদনায় ভরে তোলে। পাণ্ডবদের তথা যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাচার, পিতা দ্রোণাচার্যের অন্যায় ভাবে মৃত্যু বরণ, কৃষ্ণের চাতুরতা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। অশ্বত্থামা শিশুর মতো কেঁদে উঠে বলেন—

> "আমার পুণ্যবান অতি বিষম অস্ত্রধারী পিতাকে ওরা কাপুরুষের ন্যায় হত্যা করেছে। এ কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মপরায়ণ মানুষ, সে নিজে আমার পিতা দ্রোণকে মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়েছে। পাণ্ডবদের নিজেদের বন্ধু অবন্তীর থেকে আগত হাতি, যার নাম ছিল অশ্বত্থামা, ভীম নিজেই সেই হাতিকে গদাঘাতে হত্যা করেছে। শিখিয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং বাসুদেব। তারপর ভীম বারে বারে আমার পিতার সামনে এসে চিৎকার করে বলেছে, 'আমি স্বহস্তে অশ্বত্থামাকে হত্যা করেছি। আমার পিতা ভীমকে বিশ্বাস করেননি। তিনি পাণ্ডব পাঞ্চালদের অবধারিত মৃত্যুরূপী কালান্তক যমের মতো যুদ্ধ করেছিলেন। পাণ্ডব পাঞ্চালরা ভয়ে রণে ভঙ্গ দেবার কথা ভাবছিল। পৃথিবীর সকলেই জানে, দ্রোণাচার্যের যে সব ভয়ংকর মারণাস্ত্র আয়ত্তে ছিল, স্বয়ং স্বর্গের ইন্দ্রও তাঁর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পরাজিত হতেন। হা বাসুদেব।"[১০]

অশ্বত্থামার গলার স্বর কান্নায় ডুবে গেল। কিন্তু শোকের দীর্ঘশ্বাসে তাঁর বিষাক্ত নাগের জ্বালা। কৃপাচার্য কৃতবর্মা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। অশ্বত্থামা কৃপাচার্যকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মাতুল, আমি কেমন করে ভুলব, পিতা আমার মৃত্যু সংবাদ শুনেই, তাঁর সেই নির্ঘাৎ অস্ত্র সকল ত্যাগ করেছিলেন। চতুর নীচাশয় বাসুদেব, তিনি বুঝেছিলেন, দ্রোণাচার্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে, মিথ্যা আর অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তিনিই জানতেন, সংসারে তাঁর পুত্র ছাড়া আর অন্য কিছুর মূল্যই বড় নয়। সেই জন্যই তিনি যুধিষ্ঠিরের মতো সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকেও মিথ্যা কথা বলাতে বাধ্য করেছিলেন। ভীমের কথায় পিতার বিশ্বাস হয়নি। আর সেই দ্রুপদ রাজার ছেলে ধৃষ্টধ্যুম্ন বার বার রথ ছুটিয়ে আমার পিতাকে এসে শোনাচ্ছিল - আর কী কারণে আপনি যুদ্ধ করছেন? আপনার একমাত্র প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে নিহত হয়ে পড়ে আছে। আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে তবু এখনো ক্ষত্রিয় হত্যা করে চলেছেন। আপনি কি সৎ বোধাবোধ হারিয়েছেন? - আমার পিতা বিশ্বাস করেননি। বিশেষ করে, পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। দ্রুপদ রাজা আমার পিতার সঙ্গে প্রথমেই দুর্ব্যবহার করেছিলেন। তার শোধ নিতে, পিতা কুরু-পাণ্ডব বালকদের অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই অস্ত্রশিক্ষার গুরুদক্ষিণা হিসাবেই, পিতা পাঞ্চালরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন, কুরু পাণ্ডব শিষ্য, যোদ্ধাদের নিয়ে। আর সেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পাণ্ডবরা এমনই অকৃতজ্ঞ, গুরুকে তারা কূটযুদ্ধে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। তা হলে, ন্যায় সত্য ইত্যাদির কী মূল্য আর রইল?

কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য অমোঘ নিয়তির কথা বললে অশ্বত্থামা জানান, মিথ্যা কথা, শঠতা কখনও নিয়তি হতে পারে না। কৃপাচার্যও দ্রোণাচার্য হত্যার সেই দৃশ্য স্মৃতিচারণা করছেন। কৃপাচার্য দ্রোণাচার্যের সেই অন্তিমলগ্নের বর্ণনা করেছেন। নিকৃষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহবশত দ্রোণাচার্যকে মৃত ভেবে তার দিকে ছুটে গিয়েছিল। তাঁর হাতে তখন উদ্যত কৃপাণ। সকলেই তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল। মহাবাহু ধনঞ্জয় ধৃষ্টদ্যুম্নকে অনুরোধ করেছিলেন, যোগসমাহিত পঁচাশী বছর বয়স্ক আচার্যকে জীবিতাবস্থায় এখানে নিয়ে এসো। অর্জুন এবং আরও অনেকেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিষেদ করেছিলেন, ঐ অবস্থায় আচার্যকে হত্যা কর না। কিন্তু দ্রোণাচার্যের প্রতি জাতক্রোধবশত ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্যের রথে উঠে তাঁকে অসি দ্বারা আঘাত করলে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিজের ক্ষতের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের রক্ত ফিনকি দিয়ে তাঁর শরীর আপ্লুত হয়। পর মূহুর্তেই সে অসি দ্বারা দ্রোণাচার্যের গলা কেটে ফেলে এবং তার মুণ্ড নিয়ে ছুটে যায়।

অশ্বত্থামা রাত্রির অন্ধকারে গুপ্ত অরণ্য কাঁপিয়ে চিৎকার করে বলে উঠেন— তারপরেও আপনারা আমাকে শান্ত থাকতে বলেছেন? অশ্বত্থামার এখন প্রতিজ্ঞা—

> "ধৃষ্টদ্যুম্ন শুনে রাখো, তুমি বেঁচে থাকতে অশ্বত্থামা স্বর্গেও যাবে না। চিরকাল নরকবাস তার থেকে শ্রেয়। আমি পাঞ্চালদের- পাঞ্চালীর পুত্রদের কারওকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। প্রতিশোধ চাই, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ। অন্যায় কূটযুদ্ধে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই।"[১১]

অশ্বত্থামা প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষায় অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত চোখে একদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তার অদূরেই ছিল সহস্র শাখা যুক্ত একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। সেই বটগাছে রয়েছে অসংখ্য কাকের বাসা। সেখানে হঠাৎ গরুড়ের মতো বিশাল বেগবান পিঙ্গোলবর্ণ এক পেঁচা সেই গাছের ডালে এসে বসে। অন্ধকারে তার দুই চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তার বৃহৎ চঞ্চু আর পায়ের নখগুলির দ্বারা কাকেদের বাসাগুলি আক্রমণ করে কারো পাখা ছিঁড়ে দেয়, কারো মাথা টুকরো করে দেয়, কারো পাগুলি ছিন্ন করে দেয়। কাকেরা কা কা শব্দে বনভূমি মুখরিত করে তোলে। সেই পেঁচা একটি কাককেও নিষ্কৃতি দিল না। সবাইকে প্রায় হত্যা করলো। কাকগুলির মৃতদেহ গাছ তলায় ছড়িয়ে পড়ল।

অশ্বত্থামা রাত্রের অন্ধকারে পেচকের এই শত্রু নিধন দেখে ভাবলেন, পেচক যেন তাকেই উপদেশ দিয়ে গেলেন। এভাবেই শত্রুর নিধন করতে হয়। বিশেষ, শত্রু যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, নিরস্ত্র থাকে, তখনই তাকে আচমকা আক্রমণ করে মারা উচিৎ। অশ্বত্থামা পেচকের কাজকে তাঁর প্রতি নির্দেশ বলেই মনে করলেন। এই অমাবস্যার গভীর অন্ধকার রাত্রে, সেই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। দুর্যোধনের কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞাও ছিল পাঞ্চাল বধের। পাণ্ডব-পাঞ্চালরা আজ বিজয়ী। অস্ত্রশস্ত্রসহ উৎসাহী শক্তি সম্পন্ন। অতএব, সম্মুখ যুদ্ধে ওদের পরাজিত করতে পারা যাবে না। ধর্মানুসারে যুদ্ধ করতে গেলে নিজের প্রাণ হারাতে হবে। পণ্ডিতরা বলেন, যে বিষয়ে তোমার সন্দেও আছে, সেই বিষয়ে কাজ করার থেকে, যে বিষয়ে সন্দেহ নেই, সেই বিষয়ে কাজ করা উচিৎ। শত্রু বিনাশ করার বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেও নেই তাই তিনি যে কোন উপায়েই করবেন। আর ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করলে, লোকনিন্দিত গর্হিত কাজও করতে হয়। তার প্রমাণ পাণ্ডবরা দিয়েছে। তারা কূটযুদ্ধে অতি নীচ পন্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তাদের শঠতার কোন তুলনা নেই। তাছাড়া পণ্ডিতরা আরও বলেছেন, শত্রু পক্ষের সৈন্যরা যখন পরিশ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত, রথের চালকও নায়কহীন, অর্ধরাত্রি সময়ে নিদ্রিত, আহার প্রবেশ প্রস্থানে প্রবৃত্ত হলেও, তাদের বিনাশ করাই উচিত। এখন সেই সময় উপস্থিত।

অশ্বত্থামা মনে মনে এই কর্তব্য স্থির করে, কৃপাচার্য আর কৃতবর্মাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং এই সব কথা বললে কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা অশ্বত্থামাকে এই কাজ থেকে বিরত থাকারই পরামর্শ দেন—

> "হে ভাগিনেয়, তুমি আমার কথায় কুপিত হয়ো না। দেখ, অদূরদর্শী লুব্ধপ্রকৃতি দুর্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরামর্শ না নিয়ে অসাধু লোকের পরামর্শে, এমন কি আমাদের কথায় কান না দিয়ে, পাণ্ডবদের সঙ্গে শত্রুতা করেছিল। আমি তোমাকে বলছি, দুর্যোধন পাপাত্মা, তার জন্যই আজ আমাদের এই দুর্দশা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> তুমি যদি আমার কথা শুনতে চাও, তবে চলো, আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদূরের কাছে গিয়ে তাঁদের পরামর্শ নিই। তারা কী বলেন, কী বিবেচনা করেন শুনি এবং তাঁরা যা করতে বলবেন, আমাদের তাই করা উচিত বলে মনে করি। কাজ নিশ্চয়ই আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু পৌরুষ প্রকাশ করে কাজ আরম্ভ করলে, দৈব তার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে, কোনো সন্দেহ নেই।”[১২]

কিন্তু অশ্বত্থামা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, দুর্যোধনকে অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে বর্ম পরিধান করে, অস্ত্র নিয়ে পাণ্ডব শিবিরের উদ্দেশ্যে রহনা দেন। বাধ্য হয়ে কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা বর্ম পরে, অস্ত্র নিয়ে অশ্বারোহণে অশ্বত্থামার অনুসরণ করলেন। কারণ, আজ অশ্বত্থামা সেনাপতি। ঘোর অন্ধকার নিশীথে, তিনজনকে যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত আহ্বনীয়, দক্ষিণ ও গার্হপত্য অগ্নিত্রয়ের মতো দেখাতে লাগলো। তিনজন অরণ্য ছেড়ে, ঘুমন্ত নিস্তব্ধ পাণ্ডব শিবিরের দিকে এগিয়ে চললেন।

অশ্বত্থামা কৃপাচার্য কৃতবর্মা অত্যন্ত সন্তর্পণে নিঃশব্দে সুপ্ত পাণ্ডব শিবিরের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামার চোখের সামনে ভেসে উঠলেন, চন্দ্র আর সূর্যের ন্যায় এক মহাকায় পুরুষ। তাঁর উজ্জ্বল মুখ যেন সহস্র চক্ষুতে বিভূষিত। বিশাল দুই বাহুতে সর্পের বলয়। সেইসব সর্পের হাঁ-করা মুখের ধারালো দাঁতগুলি অতি ভীষণ। যেন আগুন ঝরে পড়ছে। সেই মহাকায় পুরুষের অঙ্গে রক্ত মাখা বাঘছাল, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। তাঁর গলায় সর্পের উপবীত। তাঁর ভীষণদর্শন চেহারা যেন বর্ণনার অতীত। দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর দর্শনে পবর্তও বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তাঁর মুখ নাক আর সহস্র চোখ থেকে ভয়ংকর তেজরাশি নির্গত হচ্ছিল, আর সেই তেজরাশির মধ্যে অসংখ্য শঙ্খগদাচক্রধারী হৃষিকেশ প্রাদুর্ভূত হতে লাগলেন। অশ্বত্থামা সেই মূর্তি দেখে বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। তিনি সেই পুরুষের প্রতি প্রথমে দিব্যাস্ত্রজাল, এরপর রক্ষশক্তি এবং অন্যান্য অস্ত্রসকল ক্ষয় করেও কিছু লাভ করতে পারেননি।

অশ্বত্থামার মনে পড়ে যায় কৃপাচার্যের উপদেশের কথা। ভাবলেন, তিনি কেবল পুরুষকারে নির্ভর করে শত্রু নিধনে এসেছেন কিন্তু দৈব তাঁর পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবকে স্মরণ করে সেখানেই শিবের ধ্যানে বসেন এবং জানিয়ে দেন—

> “হে মহাদেব, যদি আমি আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি, তাহলে আমার শরীরের পঞ্চভূত তোমাকে উপহার দিয়ে পূজা করবো।”[১৩]

এই কথা বলার অর্থ অশ্বত্থামা নিজের প্রাণ তিনি শিবকে সমর্পণ করবেন। যাইহোক অশ্বত্থামার ধ্যানে শিব সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ প্রদান করেন। রুদ্র দেবতা শিব নিজেই যেন অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করেন। অশ্বত্থামা আজ মহাশক্তিশালী। শিব অশ্বত্থামাকে নিজেই এক সুনির্মল খড়্গ দান করেন। অশ্বত্থামা অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে এবার পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করেন।

অশ্বত্থামা শিবিরের প্রধান দ্বারে কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মাকে রেখে গুপ্ত পথে শিবিরে প্রবেশ করে প্রথমে পিতৃহন্তাকারি ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়ণ কক্ষে প্রবেশ করে পদাঘাতে জাগিয়ে তোলেন। এক পা ধৃষ্টদুম্নের বুকের উপর চেপে আর এক পা দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরে সজোরে নিষ্পেষণ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের কাতর অনুরোধ ছিল অশ্বত্থামা যেন অস্ত্রদ্বারা হত্যা করেন। তাহলে তিনি পবিত্র লোকে যেতে পারবেন। কিন্তু ক্রূর হেসে অশ্বত্থামা অস্ত্র ছাড়াই ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করেন। সিংহ যেমন তার শিকারকে নখরের দ্বারা ছিন্ন করে নিজের দুই পায়ে পিষ্ট করে তেমনি খর্ণ-পীড়নের দ্বারা হত্যা করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের চিৎকারে রমণীরা সহসা ঘুম ভেঙ্গে আলুথালু বেশে নানা দিকে ছুটোছুটি করে ভয়ে কাঁদতে শুরু করেন। রক্ষীরা হতচকিত হয়ে ভয়ে আর্ত চোখে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে যায়।

এরপর উত্তমৌজা, যুধামন্যসহ একাধিক বীরদের হত্যা করেন কালান্তক যমের ন্যায়। আজ অগ্রহায়ণের অমাবস্যার ঘোর করাল রাত্রিতে, অশ্বত্থামা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর ঘাতক। তিনি আজ অবধ্য। দ্রৌপদীর পুত্ররা ধৃষ্টদ্যুম্নের বধ সংবাদ পেয়ে, অশ্বত্থামার দিকে এগিয়ে আসেন শিখণ্ডীসহ। তারা শরজালে অশ্বত্থামাকে নিপীড়ন শুরু করেন। অশ্বত্থামা সিংহনাদ করে দ্রৌপদীপুত্র - প্রতিবিন্ধ, সুতসোম, শতানীক, শ্রুতবর্মা এবং শ্রুতকীর্তিকে নির্মম ভাবে হত্যা করেন। শিখন্ডীকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দুটুকরো করে ফেলেন। অশ্বত্থামার চোখে যেন ভেসে উঠল সেই অন্ধকার বটগাছে বিশাল পেঁচকের হত্যালীলার ছবি। সাধারণ সৈন্যরা এই ঘটনাকে ভৌতিক মনে করে যে যেদিকে পাচ্ছে প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে। কৃপাচার্য, কৃতবর্মা শিবিরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে অনেকে পুড়ে মরতে শুরু করে। রমণীরা লজ্জা ত্যাগ করে নগ্নাবস্থায় ছুটতে শুরু করে। সারারাত এই হত্যালীলার পর, সকালবেলা অশ্বত্থামা থামেন। তার প্রতিজ্ঞা পালন হয়েছে। পরম সৌভাগ্য মনে করে কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মাকে তিনি জানিয়ে দেন—

> "আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, সমস্ত পাঞ্চাল, সোমক আর মৎস্যগণকে ধ্বংস করছি আর বিলম্বের দরকার নেই। এখন কুরুরাজ দুর্যোধনের কাছে যাব। তিনি জীবিত থাকলে তাঁকে এই সংবাদ দেব।"[১৪]

তিনজনেই অশ্ব ছুটিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে এসে দেখেন দুর্যোধন তখন বেঁচে আছেন। তিনি রক্তবমি করছেন শ্বাপদরা তার অঙ্গ ছিন্নভিন্ন করছেন। তাদের দেখেই সেই সব মাংসভুক পশুরা পালিয়ে যায়। তিনজনের চোখেই জল। তিন জনেই পরিতাপ করতে শুরু করেন। দুর্যোধন সবকিছু শুনে বলেন—

> "বন্ধুগণ, আজ তোমাদের আমি ইন্দ্রতুল্য জ্ঞান করছি। স্বর্গে তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে।"[১৫]

পাণ্ডব শিবিরে তখন কান্নার রোল পড়েছে। দ্রৌপদী অশ্বত্থামাকে হত্যা করে তার মাথার সহজমনি নিয়ে আসার কথা যুধিষ্ঠিরকে জানান। যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম চলেন এবার অশ্বত্থামার অন্বেষণে। অশ্বত্থামা তখন গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছেন। ব্যাসদেব এবং নারদ স্নান করছেন। তারা দেখলেন আবার যুদ্ধের পরিস্থিতি। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করলে কৃষ্ণের কথায় অর্জুন দিব্যাস্ত্র ত্যাগ করেন কিন্তু তখন ব্যাসদেব এবং নারদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় অভিশাপের বানী। কেননা ক্ষত্রিয় বীরেরা কখনো তাদের দিব্যাস্ত্র ত্যাগ করে মুনি ঋষিদের জীবন বিপন্ন করেনি। ফলে অর্জুন দিব্যাস্ত্র প্রত্যাহার করে নেন কিন্তু অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র প্রত্যাহার করতে অপারগ হন। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র পাণ্ডবসহ পাণ্ডবদের গর্ভবতী রমনীদের গর্ভনাশ হওয়ার সম্ভাবনা। কৃষ্ণ জানান—

> "শোনো দ্রোণতনয়, তুমি যা ভেবেছ, তা কখনো হবে না, উত্তরার গর্ভকখনো নষ্ট হবে না। তাঁর গর্ভজাত পুত্র জন্মাবে মৃত্যু হবে, কিন্তু সে আবার বেঁচে উঠবে, এই হল ভবিতব্য। অতএব, তুমি সময় থাকতে তোমার মাথার মণি পাণ্ডবদের দান কর।"[১৬]

ব্যাসদেবও এই উক্তি সমর্থন করেন। অশ্বত্থামা তখন, সারাজীবন অরণ্যে ব্যাসদেবের সঙ্গে বাস করবেন, এই স্থির করে, সহজমণি পাণ্ডবদের দান করেন। দ্রৌপদী এই মণিই চেয়েছিলেন।

অশ্বত্থামা ঘটনার শেষ প্রান্তে এসে, গঙ্গার ধারে দাঁড়ান। হত্যার উন্মাদনার পরে, তাঁর চোখ থেকে অবিরল জলধারা গড়িয়ে পড়ে এবং শেষবারের জন্য তিনি উচ্চারণ করেন—

> "রক্তের পিপাসা শেষ হোক, জীবন ধন্য হোক। আমি আজীবন এই পৃথিবীর মাটিতে, মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করতে চাই।"[১৭]

অশ্বত্থামা প্রথমে অস্বীকৃত হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যাসদেবের কথায় সেই মনি পাণ্ডবদের দান করেন এবং হৃদয়ের গভীরে উপলব্ধি করেন রক্তের পিপাসা শেষ হোক। জীবন ধন্য হয়ে উঠুক। যুদ্ধের শেষ সেনাপতির এই অহিংস চেতনায় শেষ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসান হয়েছে। এখানে যেন লেখকের এক গভীর জীবনবোধ কাজ করেছে। উপন্যাসের নাম 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি', 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' নয়। আসলে এই নাম করনের দ্বারা লেখক যেন সর্বোকালের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত দান করেছেন। সর্বোকালের যুদ্ধের নায়ক, সেনাপতিদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অশ্বত্থামার মত সেনাপতিদের হৃদয়ের গভীরে যদি উপলব্ধি ঘটে- হিংসা, রক্ত নয়; অহিংস, মানবতাই পারে মাটির পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ করতে, জীবন ধন্য করতে। সমরেশ বসু এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 275 - 284
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমাদের দেশের পৌরাণিক ঘটনা, বিশেষ করে মহাভারত যখন পড়ি, তখন দেখি নারী পুরুষের সম্পর্ক, তাদের যৌনজীবন, তাদের চারিত্রিক দুর্বলতা স্পষ্ট করে বলা আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে, এ সমস্ত ঘটনা আর এরকমভাবে ছিল না।"[১৮]

খুব স্বাভাবিক ভাবে তিনি আলোচ্য উপন্যাসে মহাভারতের যুদ্ধের কারণ, সময় ইত্যাদি বিষয়গুলিকে যেমন তুলে এনেছেন তেমনিভাবে আর্য-অনার্যের বিষয়টিকেও সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন।[১৯] সেই সাথে পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। কৃষ্ণকে করে তুলেছেন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সত্যবতী, ব্যাসদেব চরিত্রকে সমালোচনার বানে জর্জরিত করেছেন। দুর্যোধনকে করে তুলেছেন দীর্ঘ সংগ্রামের এক ক্ষতবিক্ষত রক্ত মাংসের মানুষ। সর্বোপরি নায়ক অশ্বত্থামা মাটির পৃথিবীর মানুষের প্রতি লেখকের জীবনদর্শনের মূল্যায়ন।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, পুনমুদ্রণঃ জুন ২০২৫, পৃ. ১১১৮
২. বড়ুয়া, সাধন (সম্পা), 'শব্দ' - কালকূট বিশেষ সংখ্যা, ১৪১এ, বান্ধব নগর, দমদম, কল্কাতা-২৮, তৃতীয় সংখ্যা, ৩য়, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১১৫
৩. হোতা (পাল), ডঃ কৃষ্ণা, 'সমরেশ বসুর উপন্যাসঃ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক', মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা - ০৯, ৯ আগস্ট, ২০১২, পৃ. ২৫
৪. চক্রবর্তী, অভিষেক, 'অশোকনগর', সাহিত্য পত্রিকা, সমরেশ বসু বিশেষ সংখ্যা, একাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা, ১৪২৪, কলকাতা - ০৯, পৃ. ১১৮
৫. বসু, ডঃ নিতাই (সম্পা), কালকূট রচনা সমগ্র-৭, মৌসুমী, ১এ, কলেজ রো, কলকাতা - ০৯, পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃ. ২৬
৬. তদেব, পৃ. ২৮
৭. তদেব, পৃ. ২৯
৮. তদেব, পৃ. ৩০
৯. তদেব, পৃ. ৩২
১০. তদেব, পৃ. ৩২
১১. তদেব, পৃ. ৪০
১২. তদেব, পৃ. ৪৩
১৩. তদেব, পৃ. ৪৬
১৪. তদেব, পৃ. ৪৭
১৫. তদেব, পৃ. ৪৮
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮
১৮. বসু, ডঃ নিতাই, 'একান্ত সাক্ষাৎকার', সমরেশ বসু, মৌসুমী, ১এ, কলেজ রো, কলকাতা - ০৯, মে, ২০২১, পৃ. ১০৬
১৯. রায়চৌধুরী, ডঃ ঝুমা, 'কথাসাহিত্যে সমরেশ বসুঃ সামগ্রিক মূল্যায়ন' (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বাশা, কলকাতা - ৭৩, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৯৬